

আমি এক স্কুল পালানো ছেলে

আসানসোলের রুটির দোকান থেকে কিশোর নজরুলকে ১৯১৪ সালে দারোগা রফিজ উল্লাহ নিয়ে এসেছিলেন ময়মনসিংহের ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রামের নিজ বাড়িতে। দুরন্ত ও খেয়ালি কবি নজরুলকে ভর্তি করে দেন ত্রিশাল উপজেলা সদরের দরিরামপুর একাডেমি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে। এখান থেকে কবি নজরুলের স্কুলযাত্রা শুরু হলেও পরে বর্ষাকালে দারোগা রফিজ উল্লাহ তাঁকে যাতায়াতের সুবিধার জন্য জায়গীর করে দেন নামাপাড়া গ্রামের বিচুতিয়া বেপারিবাড়িতে। ত্রিশাল উপজেলা সদর থেকে প্রায় চার কিমি দূরে নামাপাড়া গ্রামের বিচুতিয়া বেপারির বাড়িতে থেকে বটতলা হয়ে কিশোর নজরুল দরিরামপুর একাডেমি স্কুলে পড়তেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক তখনও হয়নি। ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে চেপে কিংবা টাঙ্গাইলের ঘুরপথ হয়ে ঢাকা যাতায়াত ছিল তখন। আর ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রাম থেকে নামাপাড়া কিংবা দরিরামপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুবই দুর্বল। তখন 'বর্ষায় নায়ে, শুকনায় পায়' এমন অবস্থা। কাদামাটির মেঠোপথ হেঁটে, কখনও শুকনি বিলের ধার ঘেঁষে কিশোর নজরুল নামাপাড়া থেকে বটতলা হয়ে যেতেন দরিরামপুর একাডেমি স্কুলে। ওই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিপিন চন্দ্র চক্রবর্তী। কবি নজরুল এই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির পর বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত ছিলেন ত্রিশালে। এই হিসেবে কবি নজরুলের ত্রিশালের অবস্থানকাল এক বছরেরও কম বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এ নিয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন গবেষকরা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব নজরুল স্টাডিজ বিভাগের গবেষক রাশেদুল আলম তাঁর 'নজরুলের ত্রিশাল অধ্যায়' বইতে উল্লেখ করেছেন ত্রিশালে কবি নজরুলকে দারোগা রফিজ উল্লাহ নিয়ে আসেন ১৯১৩ সালে। ভর্তি করেন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে কবি নজরুল চলে যাওয়ার সময় বিচুতিয়া বেপারির পুত্রবধূ সফুরজান বানু কবির হাতে কিছু নগদ অর্থ তুলে দিয়েছিলেন। নজরুল জনা জয়ন্তীর আলোচনায় বলা হয়, ত্রিশালের দরিরামপুর একাডেমির সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্সিতে কবি নজরুল ছাড়া বাকি সবাই ফেল করেন। কবি নজরুল ফার্সিতে পেয়েছিলেন ১০০। শিক্ষকরা তিন নম্বর গ্রেস দিয়ে ফেল করা ছাত্রদের পাস করালে কবি নজরুলও গ্রেস দাবি করেন। কিন্তু কবিকে তিন নম্বর দেয়া হলে পূর্ণমান ছাড়িয়ে যায়। ফলে সেটি দেয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ কবি এর প্রতিবাদে ত্রিশাল ছাড়েন। প্রীতি কুমার মিত্র স্থানীয় লোকদের উৎপাতের কারণে নজরুলের ত্রিশাল ত্যাগের কথা বলেছেন। ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহিত উল আলম প্রীতি কুমার মিত্রের এমন কথার উদ্ধৃতি দিয়ে ধারণা করেন, ভিনদেশী অত্যন্ত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ও প্রতিভাবান বালক নজরুল পুরুষ

নিয়ন্ত্রিত অনগ্রসর কৃষি সমাজে বাস করতে গিয়ে ব্যক্তি জীবনে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। হয়তবা এ কারণেই ত্রিশালের প্রতি কবির বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠায় পরবর্তী জীবনে নজরুল কখনও ত্রিশাল বেড়াতে আসেননি। এমনকি কলকাতায় ১৯৩০ এর দিকে নজরুল যখন আলোচনার তুঙ্গে, তখন দারোগা রফিজ উল্লাহ দেখা করতে গেলে নজরুল দেখা দেননি। যদিও পরবর্তীতে টেলিগ্রাম করে দারোগার কাছে কবি দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে এম বখতের মালিকানাধীন রুটির দোকানে কাজ করতেন কবি নজরুল। কাজ শেষে রাতে ঘুমাতে এক বাসার বারান্দায়। ওই বাসায় থাকতেন দারোগা রফিজ উল্লাহ ও তার স্ত্রী শামছুন্নেছা। একদিন দারোগা দম্পতি দয়াপরবশ হয়ে কবি নজরুলকে নিয়ে আসেন ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রামের নিজ বাড়িতে। এখানে প্রায় এক বছর কবি নজরুলের অবস্থানকালে গাঁও গেরামের কৃষকসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি নজরুল দারোগা বাড়িতে থাকার সময় যে পুকের সাতার কাটতেন সেটি সংগ্রহ করে শব্দকোষ তৈরি করা হয়েছে। এই



দারোগা বাড়িতে বসেই কবি রচনা করেন বাদশাহ বেগম, কামরুন্নাহম বাড়িয়ে চলেছি, আমি বাদশাহ বনেছি, বেগম সেজেছি ইত্যাদিসহ অনেক গান ও কবিতা। এখানে কবি বিয়েবাড়িতে সুরের পুঁথি পড়েছেন, গান শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন স্থানীয়দের। দুরন্ত কবি স্কুলে যাওয়ার পথে বই ফেলে নেমে যেতেন কৃষকের ক্ষেত খামারে, হক্কা টানতেন। ঘেঁটু গানের দল করেছেন। এভাবে গাঁও গেরাম মাতিয়ে রাখতেন কবি। নামাপাড়া গ্রামের বিচুতিয়া বেপারি বাড়িতে জায়গীর থাকার সময় দরিরামপুর স্কুলে আসার পথে গড়ে শুকনি বিলপাড়ের বিশাল বটগাছ। কবি বটগাছে উঠে সুর করে বাঁশি বাজাতেন। বটগাছে বইখাতা রেখে ক্ষেতে নেমে গাল গেয়ে মাতিয়ে রাখতেন। সেই বটগাছ নেই। তার জায়গায় নতুন করে বটগাছ লাগানো হয়েছে। নাম বটতলা। এই বটতলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিচুতিয়া বেপারি বাড়ির বধূ সফুরজান কবি নজরুলকে খুবই আদর স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। জনশ্রুতি আছে, একবার সফুরজান কবিকে বাড়ির পাশের ক্ষেত থেকে পাকা বাগী তুলে আনতে বলেছিলেন। এই হুকুম যেন বার বার

শুনতে না হয়, এ জন্য কবি গাছসহ সব বাগী তুলে আনেন। ত্রিশালে পড়ালেখার বদলে কবি পুরো সময় কাটিয়েছেন সমাজের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সঙ্গে। ওই সময়ের দরিরামপুর একাডেমির ইংরেজী শিক্ষক মহিম চন্দ্র বলেছিলেন, নজরুল ক্লাসে চুপচাপ থাকতেন এবং পড়ালেখায় ছিলেন ভীষণ অমনোযোগী। তবে তিনি স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকশ্রোতাদের মাতিয়ে রাখতেন। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কোন রিহার্সেল ছাড়াই নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভূত' কবিতা আবৃত্তি করে প্ররস্বাব পেয়েছিলেন। দরিরামপুর একাডেমি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর পড়ালেখায় ছিলেন চরম অমনোযোগী। সকাল বেলা বই নিয়ে বের হয়ে দিনভর ক্ষেতে খামারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন। পরীক্ষা নিয়েও নজরুলের কোন মাথাব্যথা ছিল না। একবার বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার দিন সবার নাম ডাকা হলেও নজরুলের নাম ডাকা হয়নি। কারণ খাতায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখার বদলে লেখা ছিল দীর্ঘ কবিতা, 'রবো না কৈলাশপুরে, আই অ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং, যতসব ইংলিশ ফ্যাশান, আহা মরি কি লাইটনিং! ইংলিশ ফ্যাশান সবই

তার, মরি কি সুন্দর বাহার- দেখলে বন্ধু দেয় চোয়ার, কাম অন ডিয়ার গুড মর্নিং।' স্কুলের শিক্ষকরা সেদিন এ। কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। দরিরামপুর স্কুলের কৈলাশ দত্ত বলেন নজরুলের প্রিয় শিক্ষক। এই শিক্ষকের কাছ থেকেই কবি প্রতিবাদ ও বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, প্রিয় শিক্ষকের নাম দিয়েই প্রতিবাদী ছড়া কবিতা লেখেন নজরুল। একই স্কুলের শিক্ষক মহিম চন্দ্র কবিকে দেন গানের প্রেরণা আর খিদির উদ্দীন পণ্ডিত কবিকে দেন কবিতা লেখার উৎসাহ। একদিন রাতের আধারে নজরুল কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হন। এ নিয়েও রয়েছে নানা কাহিনী। বিভিন্ন গবেষকদের মতে ত্রিশালের নতুন পরিবেশে কবির অবস্থান ছিল মাত্র কয়েক মাসের। কারণ মতে এক বছর, কারণ মতে দুই বছর। ১৯১৪ সালে দরিরামপুর একাডেমিতে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির পর কবি নজরুল ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের আধারে চলে যান এবং শিয়রসোল রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই হিসেবে ত্রিশালে কবির অবস্থান কয়েক মাস। ১৯১৩ সালে স্থাপিত স্কুলটির নতুন নামকরণ করে দরিরামপুর নজরুল একাডেমি করা হয়েছে। তৎকালীন হাইস্কুলের প্রথম কক্ষটির দেয়ালে কবির লেখা মর্মর পাথরে খুঁদিত রয়েছে, 'আমি এক পাড়ার্গেয়ে স্কুল পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না, স্কুলের হেড মাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জল তেঁটা পেয়ে যায়।' মর্মর পাথরে কবির লেখাটিতে অবহেলার ছাপ পড়েছে।

- বাবুল হোসেন, ময়মনসিংহ থেকে